রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা*

--মো: আনিসুর রহমান

আবদুল আহাদ এদেশের প্রথম সুবিদিত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক এবং আমার ও অন্য অনেকের মতে এদেশের সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছেই তিনি অনেক গান শিখেছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর কাছে কিছু রবীন্দ্রসংগীত (এবং নজরুল সংগীতও) শেখবার, এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার। স্পষ্ট মনে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেছিলেন-যে খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণ করে কবির দেয়া সুরে তাঁর বাণীকে পরিবেশন করাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী, এ ছাড়া কবির গানের গায়কীর আর কোন নিয়ম নেই। একথা নিয়ে মনে হয় আজও কোন কোন মহলে বিতর্ক আছে, কিন্তু আহাদ ভাইয়ের এই কথা আমি সব সময় শিরোধার্য করেছি।

আমার বর্তমান আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা নিয়ে[১]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতের দর্শন, প্রত্যয় ও আনুসঙ্গিত অনেক বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে লিখেছেন, এবং তাঁর এ বিয়য়ে প্রায় সমস্ত লেখাই, এবং কয়েকজন গুণীজনের সঙ্গে এ সবের আনেক বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা, একসঙ্গে করে তাঁর ‘সংগীতচিন্তা’ নামে বইতে সংকলিত হয়েছে বহু আগে। বলা বাহুল্য, যে কোন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাক্রমে এই বইটি স্বভাবতই অবশ্য পাঠ্য হবার এবং গভীরভাবে আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু দুংখের বিষয় এই যে আমি শুধু এদেশে নয়, কলকাতা এবং পাটনাতেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনেছি যে তাঁরা কবির ‘সংগীতচিন্তা’ ক্লাশে আলোচনা তো দূরের কথা, এই অমূল্য বইটি না পড়েই রবীন্দ্রসংগীতে ছাড়পত্র পেয়েছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের গান করে চলেছেন এ সম্বন্ধে কবির নিজের দর্শন ও চিন্তা না জেনেই। সত্যিকারের প্রতিভাবান্ শিল্পী এ

---

*লেখক পরিচিতি: অর্থনীতিবিদ্, রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী এবং রবীন্দ্রসংগীত ও কন্ঠচর্চা শিক্ষক। ২০০৪ সালে রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীতে পাটনার রবীন্দ্র পরিষদ কতৃক রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রসাহিত্যে অবদানের জন্য দ্বিবার্ষিক “রবীন্দ্র পুরষ্কার” প্রাপ্ত।

[১] এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলির ওপর লেখকের পূর্বের আলোচনা তাঁর *অসীমের স্পন্দ বইতে (আনিসুর রহমান ১৯৯৫)*। বর্তমান প্রবন্ধটি আবদুল আহাদ স্মরণে বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ করে লেখা।

সত্ত্বেও প্রাণহরণকর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে পারেন এবং করে চলেছেন এ কথা অনস্বীকার্য; কিন্তু অন্যান্য অনেক শিল্পী-যে কবির সংগীতচিন্তা পড়ে নিজের চেতনা আরো সমৃদ্ধ করে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসাবে নিজেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারতেন একথা বোধ হয় তর্কের অপেক্ষা রাখে না। আর প্রতিভাবান শিল্পীরাও কবির সংগীতচিন্তা পড়ে বা আলোচনা করে তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত, (তথা যে কোন আর্টসংগীত) সম্বন্ধে নিজেদের চিন্তার সাথি পেয়ে আরো সমৃদ্ধ অথবা অন্তত: তৃপ্ত হতে পারতেন একথাও বোধ হয় সাজেস্ট করা যায়।

'বেল কান্তো' অর্থাৎ 'সুন্দর গান'

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা তাঁর অন্যান্য বিষয়ে চিন্তার মতো বিশ্বের সংগীতচিন্তার পূরোভাগেই ছিল। বিশ্বে জানামতে সুন্দর গানের প্রথম গুছিয়ে ধারণার জন্ম ও প্রসার হয় ষোল-সতের শতাব্দীতে ইতালিতে, যেখানে সে সময়কার সঙ্গীতের অসাধারণ বিকাশকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেনেসাঁ বলে অভিহিত করা হয়। ইতালীয় সঙ্গীতের এই বিকাশে সুন্দর গান সম্বন্ধে একটা প্রত্যয় প্রচলিত হয় এবং দানা বাঁধে যে প্রত্যয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতে আজো সব বড়ো সংগীত-শিক্ষক এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে চলেছেন। এই প্রত্যয়ের নাম ইতালীয় ভাষায় 'বেল কান্তো' যার অর্থই হল 'সুন্দর গান'। বেল কান্তো গানের প্রত্যয়ের দুটি প্রধান চরিত্র ছিল: একটি হল *'beautiful legato singing'*— লিগাটো গাওয়া অর্থ মিলিয়ে মিলিয়ে গাওয়া যাকে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে "আশ-সহযোগে গাওয়া" বলে। অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরি এ সম্বন্ধে লিখেছেন, *"আশ প্রক্রিয়ার কাজ হল একাধিক স্বরবিন্যাসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যতা রক্ষা করা। আরও সহজভাবে বলতে গেলে গানের প্রতিটি স্বর কাটা কাটা ভাবে উচ্চারণ না করে সংযোগ রক্ষা করে গান করা।... আশ্ গায়নই গাইবার সাধারণ বিধি।...মালার মধ্যে ফুল যেমন বিচ্ছিন্ন না থেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে - গানের মালার মধ্যেও স্বররূপ ফুল ব্যবধানরহিত হয়ে গায়ে গায়ে লেগে থাকে" (নীহারবিন্দু চৌধুরী: ১২৬-১২৭)*। গানে পাশাপাশি সুর কাটাকাটা করে না গেয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে গাইলেই তা সুন্দর হয়, ভারতীয় রাগ সঙ্গীতেও এভাবেই গাওয়া হয়।

বেল কান্তো গানের আর একটি চরিত্র হল "the ability to sing enormously long bowed phrases over a wide range, changing constantly from the softest *piano* to the strongest *forte* and back again with no breaks in the line, no abrupt transmissions, to interrupt the easy flow of the voice" (Hustler & Rodd-Marling: ৮২). অর্থাৎ বিরাট রেঞ্জ জুড়ে সুরের অনায়াসে ওঠানামা, যে ওঠানামায় সুর মৃদুতম থেকে বিশালতম হয়ে ফুলে উঠছে আবার

মৃদুতম হয়ে যাচ্ছে, এবং সুরের এই মূর্চ্ছনা কোথাও হঠাৎ কোন বাধা পাচ্ছে না, কণ্ঠ অত্যন্ত অনায়াসে বয়ে চলেছে।

বেল কান্তো গানের এই প্রত্যয়টিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক চোখে সমুদ্রের ঢেউএর ওঠানামা বলে দৃষ্ট হয়েছে - যেমন কবি বলেছেন: "সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে,... কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ" (রবীন্দ্রনাথ, "অন্তর বাহির", *সংগীতচিন্তা*: ৩৪)

সমুদ্রের ঢেউএর সৌন্দর্যনাচের মতো সুন্দর গানের এই প্রত্যয়ের কয়েকটি অবয়ব আর একটু কাছ থেকে লক্ষ্য করা যাক:

(সুন্দর) গান *তরল* (fluid), যার অর্থ হল যেখানেই সে আছে সেখান থেকে সে অনায়াসে স্ফীত হয়ে ওঠবার অথবা আরো হাল্কা হয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে[২]। এই ক্ষমতা গানকে নমনীয়তা দেয়, অর্থাৎ সুরে কোনরকম চাপ বোধ হয় না যেমন জলের ঢেউতে কখনোই কোনরকম চাপ নেই।

(সুন্দর) গান যে 'হেঁটে' চলে না, *বয়ে চলে* (আশ-সহযোগে চলে) একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানেরই চরণে চরণে নানাভাবে বলে গেছেন, যেমন, "বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী"; "আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া"; "আমার ঢালা গানের ধারা"; ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই বয়ে গাওয়ার একটি বিশেষ 'জড়ানো' রূপের আলোচনা করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'গড়ানে করে গাওয়া', যার অপরূপ কাব্যিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এইভাবে: "এক সুর কেবল যে আর এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয়, তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে" - যেন এক সুর থেকে আর এক সুরে যাওয়া-আসার মুহূর্তগুলো অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে, যেন পরের সুর আগের সুরের সঙ্গে প্রথমে জড়িয়ে থেকে তারপর ছাড়তে না চাইতে চাইতে ছেড়ে দেয়, এবং এভাবে, কবির ভাষায়, "তাদের মধ্যে [একটা] বেদনার সম্পর্ক থাকে... যা লইয়া আমাদের সংগীতের গভীরতা" ("সংগীতের মুক্তি", *সংগীতচিন্তা*: ৫৫-৫৬)। বলা বাহল্য, সমুদ্রের ঢেউপ্রবাহ এইভাবে 'গড়ানে করে' অর্থাৎ আগে-পরের ঢেউকে জড়িয়ে জড়িয়ে চলার দৃষ্টান্তে ভরা।[৩]

---

[২] রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায়ের সঙ্গে গায়কের স্বাধীনতা আলোচনা প্রসঙ্গে গানের তরল গতির উল্লেখ করেছেন। ("আলাপ-আলোচনা", *সংগীতচিন্তা*: ১২৮)।

[৩] রবীন্দ্রনাথ যাকে 'গড়ানে করে গাওয়া' বলেছেন তাকে পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রে 'লিগাটিসিমো' বলা হয় , - " either a more forceful indication of legato, or a sort of superlegato in which the preceding note is held for a moment together with the following one" (Apel & Daniel: ১৫৫), অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দুটি সুরের মধ্যে "নাড়ীর সম্বন্ধ" থেকে তারপর আলাদা হয়ে যাওয়া।

এভাবে প্রবাহমান সুন্দর গানে তার নিজস্ব মূর্ছনা থাকে - কখনো সে হাল্কা হয়ে বয়ে যায়, কখনো প্রবলতর হয়ে। কিন্তু সব সময়েই সে বয়ে (flow করে) যাচ্ছে, সব সময়েই সে সুন্দর। এগান হাল্কা হয়ে বইলেও কেউ তাকে চেপে রাখে নি - সে হাল্কা হয়েও মুক্ত, স্বাধীন; যখন সে প্রবল তখনো তার ওপর কেউ জোর করছে না, সে আপন আনন্দে উছ্লে উঠেছে, মেতে উঠেছে, সমুদ্রের ঢেউ যেমন আপনিই উছ্লে ওঠে, মেতে ওঠে, কেউ তার ওপর জোর করে না। এই অর্থে সুন্দর গান কখনো 'জোরে' শ্রূত হয় না, - এ গান প্রবল হয়ে উঠতে পারে, ফুলে উঠতে পারে, কিন্তু এখানে কোন 'জোরাজুরি' নাই, শিক্ষক কখনো শিষ্যকে বলবেন না যে "আরো জোরে গাও", বলবেন "আরো প্রবল কণ্ঠে গাও, আরো বলিষ্ঠ করে গাও, আরো মেতে ওঠো, সুর আরো ফুটিয়ে দাও", ইত্যাদি। এবং যে কোন ভল্যুমেই সুর থাকুক না কেন, কেউ তাকে সেখানে চেপে রাখে না - সে সব সময়েই মুক্ত। এবং এই মুক্ততার জন্যই এই সুর সুন্দর। মুক্ত কণ্ঠে গাওয়া অর্থও 'জোরে' ("গলা খুলে" অর্থে) গাওয়া নয় - মুক্ত কণ্ঠে খুব হাল্কা করেও গাওয়া যায়, বলিষ্ঠ করেও গাওয়া যায়, কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই কণ্ঠে কোন চাপ থাকে না, যে ভল্যুমেই আছে কণ্ঠের নিজস্ব ক্ষমতা থাকে সেখান থেকে ইচ্ছামতো আরো হাল্কা হয়ে যেতে অথবা আরো ফুলে উঠ্তে যে কোন তরল পদার্থের মতো - এই fluidity-ই কণ্ঠকে মুক্ততা, এবং এই মুক্ততার সৌন্দর্য, দেয় সমুদ্রের মুক্ত ঢেউপ্রবাহে যে সৌন্দর্য রয়েছে।

সমুদ্রের ঢেউএর আর একটি সুন্দর চরিত্র এই যে ঢেউ - যেন অতল থেকে - ভেসে ওঠে, আবার যেন অতলে মিলিয়ে যায়। সুন্দর গানেও তেমনি সুর ভেসে ওঠে যাকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভাষায় 'ফেড্ ইন'বলে, এবং বিলীন হয়ে যায় অর্থাৎ 'ফেড্ আউট্' করে, যেন, রবীন্দ্রনাথের গানের চরণের ভাষায়, 'নীরব বীণা' থেকে সুর উঠে আসে আবার 'নীরব বীণা'তে ফিরে যায়।

সমুদ্রের ঢেউএর রং বদলায় সূর্য-চন্দ্র-মেঘ-বৃষ্টির ছোঁয়ায়, নিজের গভীরতা ও গতিশীলতার প্রভাবেও। সুন্দর গানেরও রং বদলায় গানের, এবং একই গানের বিভিন্ন চরণের, ভাব অনুযায়ী - কখনো সুর মিষ্টি-মধুর, কখনো মধুর-গম্ভীর, কখনো গভীর, কখনো ব্যাথা-ভরা, কখনো উদাস, কখনো আবেশ-বিহ্বল, কখনো করুণ, কখনো কাতর, কখনো সজল, কখনো হাসি-ঢালা। এইভাবে সুন্দর গান "তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল" বোনে।

সবশেষে, সমুদ্রের জল স্বাধীনভাবে টলমল করে, যে গুণটি ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে 'কম্পন' - ইংরেজীতে 'ভাইব্রেটো' - নামে একটি অলঙ্কার বলে পরিচিত। গানে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে, কম্পনের ব্যবহার সম্বন্ধে সুবিনয় রায়ের আলোচনা উল্লেখযোগ্য:

“একটি স্বরবর্ণের সাহায্যে বা humming করে একই স্বর বারবার উচ্চারণ করলে কম্পনের সৃষ্টি হয়।...একই স্বরকে ভিত্তি করে স্বরপ্রকাশের এই যে আন্দোলিত (undulated) তরঙ্গভঙ্গী, এর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আছে। পাশ্চাত্য দেশের কণ্ঠসংগীতে এই কম্পন ...খুব যত্নের সঙ্গে চর্চা করা হয়।
”ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ইত্যাদি হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে কম্পনের ব্যবহার লক্ষিত হয় না। তবে এই অলঙ্কারের মার্জিত রূপ ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রবীন্দ্রসংগীতে এবং অন্যান্য বাংলা গানে প্রায়ই শোনা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলি বেশ শ্রুতিমধুরই হয়ে থাকে। গ্রন্থকারের মতে পূর্বোক্ত মাঝারি গতির আন্দোলন বা কম্পন বাংলা গানে বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে যথাস্থানে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহার করা যায়।” (সুবিনয় রায়:২০-২২)

এই আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে সমুদ্রের ঢেউএর স্বাধীন সৌন্দর্যনাচের সঙ্গে কেন তুলনা করেছেন তা আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না। এবং ওপরের আলোচনা থেকে একথাও স্পষ্ট যে, বিশ্বের সংগীতদর্শনের পূরোভাগে ‘বেল কান্তো’ বা ‘সুন্দর গান’-এর প্রত্যয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্রত্যয় একাত্ম। এবং এটাও উল্লেকযোগ্য-যে রবীন্দ্রনাথের এই সংগীতচিন্তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যবোধ-জাত - তিনি কোনভাবে ‘বেল কান্তো’ সংগীত চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এরকম জানা নেই।

রবীন্দ্র সংগীতচিন্তায় রাগসংগীত

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের সুরের ভিত্তি ভারতীয় রাগসংগীত একথা সবারই জানা। কিন্তু মুক্তমনা রবীন্দ্রনাথ কোন ব্যাপারেই কোন নিয়মের শাসন মানেন নি একথাও জানা। রাগসঙ্গীতের ওপর তাঁর বহু গানের সুর ভিত্তি করেও রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর একটা সৃষ্টিশীল টেনশন্ (creative tension) ছিল বলা যায়। এই টেনশন্ ছিল সুরের ব্যাপারেও, তালের ব্যাপারেও।

সুরের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বহু গানে কোন না কোন রাগের সঙ্গে সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েও পূরোপূরি শাস্ত্রসম্মতভাবে এ সমস্তের অনেক গানেই কোন বিশেষ রাগ পূরোপূরি অনুসরণ করা হয় নি। স্বরলিপিতে এরকম অনেক গানকে “মিশ্র-অমুক রাগের” সুর বলে পরিচিতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই নামকরণ রবীন্দনাথের নিজের নয়, এবং তাঁর সংগীতচিন্তা পড়ে মনে হয় না যে এতে তাঁর অনুমোদন ছিল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁকে এ সম্বন্ধে একবার প্রশ্ন করলে কবি তাঁকে লিখেছিলেন,

“গানের কাগজে রাগ রাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে

সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম।" ("বিবিধ প্রসঙ্গ", *সংগীতচিন্তা* : ২৪৫)। ইন্দিরা দেবী এব্যাপারে তাঁকে চাপ দিলে কবি পরে তাঁকে লেখেন:

"আমার আধুনিক গানে রাগ-তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তাহলে দাঁড়াব কোথায়? ধূর্জটিকে দিয়ে নামকরণ করিয়ে নিস" (ঐ)। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রস দিয়ে একটু ঢিলে দিয়ে একথা বললেও তাঁর অন্যান্য বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কবি বাঙালি সংগীতের শাস্ত্রীয় সংগীতের কাছে আত্মসমর্পন চান নি, শাস্ত্রীয় সংগীতকে আদরে গ্রহণ করে তাকে প্রয়োজন মতো এদিক-ওদিক করে বাঙালি সৃষ্টিশীলভাবে তার নিজের মনের ভাব প্রকাশ করবে এটাই তিনি চেয়েছিলেন:

"হিন্দুস্থানী সংগীত সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা ...তাকে আমরা শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করবার জন্য নয়। ...এই গান কি একদিন সৃষ্টির গৌরবে চলৎশক্তিহীন হিন্দুস্থানী সংগীতকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে যাবে না?" ("সুর ও সংগতি", *সংগীতচিন্তা*: ১৩৫)।

এই প্রশ্নে কবি আরো বিস্তারিত ব্যখ্যা দিয়েছেন তাঁর "সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধে:

"আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগ রাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগ রাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগ রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন? যেমন আমাদের বাংলাদেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য দান করিতেছে।.তেমনি আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক না কেন, রাগ রাগিণী সেই সর্বব্যাপী আকাশের মতো তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতেছে।"

কিন্তু এইভাবে আকাশের ঔদার্য পেয়েও আমাদের গান তার নিজস্বতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে। এই কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বাউল গানে রাগ-রাগিণীর উপস্থিতি আলোচনা করে বলেন:

"একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী, ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ

রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোন রাগকৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না - স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি নয়।

"এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা বড়ো আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদেও সাহস বাড়িবে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে।" ("সংগীতের মুক্তি", সংগীতচিন্তা: ৬১-৬২)

বলা বাহুল্য, কবির রাগসংগীতকে আপন করে নিয়ে তাকে সৃষ্টিশীলভাবে mould করবার পেছনে প্রেরণা ছিল তাঁর বাণীকে প্রকাশ করা, কোন বিশেষ রাগ অনুসরণ করা নয়। এটা দু:খজনক যে স্বরলিপিকাররা তাঁর অনেক গানে রাগ-নির্দেশ করে কবির বাণী প্রকাশের আকুলতাকে যেন গৌণ করে দেখেছেন রাগ-নির্দেশকেই প্রাধাণ্য দিয়ে, এবং বাঙ্গালির গানে বাণী ও সুরের মিলন-তৃষ্ণা কবি যেভাবে দেখেছেন এবং এই তৃষ্ণাকে চরম পূর্ণতা দেবার যে সাধনায় কবি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তা থেকে চিন্তাকে detract করে।

রবীন্দ্র সংগীতচিন্তায় তাল ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের এরকম মুক্তি চেয়েছিলেন শুধু সুর সম্বন্ধেই নয়, শাস্ত্রীয় তাল এবং তার সঙ্গত তবলা সম্বন্ধেও।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তবলার তাল সহযোগে কখনোই গান করেন নি, তাঁর সময়ে অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত গায়ক-গায়িকাও করেন নি, এমনকি রেকর্ড করতে যেয়েও। বর্তমান লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করে জানেন যে কবি কখনোই তাঁর পরচালনায় কোন গানের অনুষ্ঠানের জন্য তবলা চান নি। অথচ তাঁর সময়ে শান্তিনিকেতনে শাস্ত্রীয় গানে তবলার ব্যবহার পূরোপূরি প্রচলিত ছিল, এবং তাঁর গানের অধিকাংশ স্বরলিপিতেও শাস্ত্রীয় তালের নির্দেশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অকারণে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমকালীন প্রথা অস্বীকার করে এরকম অবস্থান নেন নি - এই প্রশ্নে তাঁর চিন্তা ও অবস্থান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং বিশ্বের পুরোভাগের সংগীতবিজ্ঞান ও চেতনার সঙ্গে একাত্ব ছিল, যে অবস্থান আজ অবধি দুই বাংলার সংগীতমহলে মোটামুটি অস্বীকৃত বা অবহেলিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তালে তবলার সঙ্গতের বহুল প্রচলন অন্যান্য গানের মতো রবীন্দ্রসংগীত গাইবার সংস্কৃতিরও একটি বড়ো অঙ্গ হয়ে রাজত্ব করছে।

প্রথমে শাস্ত্রীয় তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের আলোচনা লক্ষ্য করা যাক্। তাঁর কথায়,

"তালও ভাবপ্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়।...[তবে] ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই হয়, তাহার উপরে আরোও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবক যে-একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র।...

"আমাদের সঙ্গীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না।"("সংগীত ও ভাব", *সংগীত চিন্তা*: ৬-৭)

"সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়াই। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ তখন তাল বলে 'আমাকে দেখো', সুর বলে' আমাকে'। কেননা, দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে ...কতৃত্বের আসন কে পায় - মাঝে হইতে সংগীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

"তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদেও দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করিতে হইয়াছে, কেননা মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব।...লাঠিয়ালের হাতে রাজদন্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুরতালের কৌশল হইয়া

ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে...

"কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কি, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের[৪] সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।" ("সংগীতের মুক্তি", সংগীতচিন্তা:৬৪-৬৬)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের তাল সম্বন্ধে এই দর্শন বুঝে শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর শেষের দিকের কিছু স্বরলিপিতে শাস্ত্রীয় তালে স্বরলিপি না করে শুধু মাত্রা-বিভাগ দেখিয়েছেন - যথা: ৫৮ নং স্বরবিতানে "বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে" গানের স্বরলিপিতে চার মাত্রা করে ভাগ যা কোন শাস্ত্রীয় তালে পড়ে না, কিন্তু এ গানটি কাহারবা অথবা ত্রিতালে সোম-ফাঁক দিয়েও গাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ গানেরই স্বরলিপিতে এরকম সোম-ফাঁক দিয়ে গাইবারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের তাল (ছন্দ/লয়) দর্শনের পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয় যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বেশ কিছু নতুন 'তাল' উদ্ভাবন করেছেন একথা সবারই জানা, কিন্তু তাঁর তাল-দর্শন থেকে একথা স্পষ্ট যে তিনি এসমস্ত তালের ছন্দ বা 'লয়'কেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সোম-ফাঁকের নিয়মকে নয়, এবং এসব গানের স্বরলিপিতে যে সোম-ফাঁকের নির্দেশ রয়েছে এগুলি স্বরলিপিকারদের ওস্তাদি যা নিয়ে কবি গান ধরে ধরে বিবাদে না যেয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখাতে সার্বিক প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন।[৫]

অত্যন্ত দু:খের বিষয় রবীন্দ্রনাথের তাঁর গানে শাস্ত্রীয় তালের ব্যবহার সম্বন্ধে এই দর্শন - যে দর্শন বিশ্বের অন্যান্য কালচারের সংগীত দর্শনের সঙ্গে মিলে যায় যে সব কালচারে সোম-ফাঁকের বাঁধন নেই কিন্তু ছন্দে-লয়ে সমৃদ্ধ অসাধারণ সুন্দর সঙ্গীত সৃষ্টি হয়ে চলেছে - আজো প্রাতিষ্ঠানিক রবীন্দ্রসংগীত মহলে অবহেলিত হয়ে আছে।[৬] আজকাল এদেশেতো

---

[৪] এখানে স্পষ্টতই কবি লয়ের ছন্দের কথা বলছেন, এবং এই বিশেষ বাক্যে তাল বলতে শাস্ত্রীয় তালের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

[৫] সত্যজিত রায়ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তবলার ব্যবহারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন: "তবলার সংগতে ওস্তাদি মেজাজটা বড়ো চট্ করে এসে পড়ে।... কাজেই ওটার বদলে যন্ত্রকেই তালের কাজে লাগানো উচিত" (সত্যজিত রায়: ৭১)

[৪]আমি একবার কলকাতায় রবীন্দসদনে গাইবার পর বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন আমার হোটেলে আসেন এবং বলেন, "আপনি তো বেশ করলেন - তবলা ছাড়া দিব্যি গেয়ে দিলেন! আমরা তো সাহস পাই না। খুব ভালো লেগেছে"। আমি বল্লাম, "ভালো লাগলে সাহস পাবেন না কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমাদের তো এটা রুজির ব্যাপার, তাই বাজারের দিকে খেয়াল রাখতে হয়!" বাজার অর্থনীতির দৌরাত্মেই যে এই ঘটনা ঘট্ছে আমি অর্থনীতিবিদ হয়েও এই সত্যটা এর আগে উপলব্ধি করি নাই!

একজনের গানের সঙ্গে তিন সেট তবলা সঙ্গতও দেখা যায়, প্রত্যেকটা সেটের ওপর একটা করে আলাদা মাইক্রোফোন স্থাপন করে! গান শুনব, না তবলা শুনব? আর বহুকাল থেকে দেখা যায় কোন কোন কণ্ঠশিল্পী গাইতে গাইতে ঘন ঘন তবলার দিকে তাকাচ্ছেন, হয় গানকে প্রাধান্য না দিয়ে তবলার তালের সঙ্গে মিল রাখবার আড়ষ্ট চেষ্টায়, অথবা অসোয়াস্তি -তে মাথা নেড়ে নেড়ে তবলা-শিল্পীকে ইঙ্গিত করতে লয় একটু বাড়াতে বা কমাতে। এদিকে বেচারা গানের কী অসহায় অবস্থা! আমি নিজে আজ পর্যন্ত শুধু দুইজন তবলা-শিল্পীর সঙ্গে গান করে আরাম পেয়েছি - একজন এদেশের একজন রবীন্দসংগীত-শিক্ষক ওহিদুল হক, আর একজন আমার প্রিয়ভাজন অর্থনীতিবিদ্ ও সুগায়ক ইকবাল আহমেদ, যাঁরা দুজনেই রবীন্দ্রসংগীত গানও করেন যে জন্য তাঁরা গানের মর্যাদাহানি করে কখনো তবলাকে প্রাধান্য দেন না। কিন্তু এরকম গায়ক-তবলাশিল্পীকে তবলা সঙ্গ দিতে সাথী পাওয়া তো গায়কের ভাগ্যের কথা!

রবীন্দ্রনাথের তালের (ছন্দের) চেতনা যে কত গভীর ছিল এবং আধুনিক গায়ন-কলা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কিছু পত্রালাপ থেকে যে পত্রালাপ কবি নিজেই তাঁর সংগীত-চিন্তা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কবি ধূর্জটিপ্রসাদকে এক চিঠিতে "*অন্তরে যে ঘড়িটা রক্তের দোলায় চলে*" *তার উল্লেখ করেন। ধূর্জটিপ্রসাদ এই কথাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করে কবিকে লিখে পাঠান এবং কবি তা অনুমোদন করেন। ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়,*

"রক্তের দোলায় যে সময় দোলে সেই organic timeএর সঙ্গেই গানের সম্বন্ধ আছে।...আমি যে অর্থে organic time ব্যবহার করছি তা mechanical timeএর বিপরীত। এই দুটোর মধ্যে স্বতঃই একটা বিরোধ রয়েছে*...mechanical time হল ঘড়ির কাঁটা - মাপা ঘণ্টা, তার মাপ মিনিট ও সেকেণ্ডের যোগ-বিয়োগে। এবং যেখানে যোগ-বিয়োগই উপভোগের মাত্রা নির্দ্ধারণ করে সেইখানেই 'গান থামবে কবে' প্রশ্নটি শ্রোতাকে উত্যক্ত করে।...কিন্তু সহজ আগ্রহ ও কালের হ্রাসবৃদ্ধির মাপ নেই, ছন্দ আছে। সে ছন্দ সংখ্যামূলক নয়, অর্থাৎ তার পেছনে matter কি motion-এর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নেই; আছে সেই সব ঘটনা ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যার দরুণ বৃদ্ধির হার কমে বাড়ে, তার অবস্থানান্তরপ্রাপ্তি হয়।*

mechanical time অনুসরণ না করে organic time অনুসরণ করবার দিকে কবির আগ্রহ তাঁর "সংগীতের মুক্তি" রচনা থেকে ওপরে তাল-ছন্দ-লয় বিষয়ে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা থেকেও স্পষ্ট। এ বিষয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যে চেতনা প্রকাশ করেছেন তার

প্রতিধ্বনি পাশ্চাত্য সংগীতচিন্তা ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ-শিল্পী-সংগীতশিক্ষক ফ্রেডরিক হাসলার ও তাঁর শিষ্য ইভন রড্ মার্লিংএর নিম্নোক্ত উক্তিতেঃ
"the steadily counted beat is the antithesis of rhythm, whose origin lies in the incalculable sources of subliminal life. That is why singers are seriously handicapped by a conductor whose baton lacks the vibrant rhythmic impulse which should be coming from the depths of his own vital substance…
"organic being has no capacity for living 'technically'; to impose technical measures upon it invariably signifies the presence of some alien force." (হাসলার ও রড-মার্লিংঃ ১১২)।[৭]

অর্থাৎ "নিয়ম-বাঁধা (তালের) ঠেকা ছন্দের একেবারে বিপরীত, যে ছন্দের উৎস হিসাব-নিকাশের বাইরে অবচেতন মনের গভীরে [যেমন সমুদ্রের ঢেউএর ছন্দের উৎস তার অতল গভীরে - লেখক]। এইজন্য কনডাক্টারের ছড়িতে তাঁর জীবন্ত সত্তার গভীর থেকে উৎসারিত ছন্দময় স্পন্দন না পাওয়া গেলে গায়কদের তাঁকে অনুসরণ করতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়...
"কোন জীবন্ত মানুষ 'টেক্‌নিকালি' জীবনধারণ করতে পারে না - তার ওপর কোন টেক্‌নিকাল আচরণবিধি চাপিয়ে দেবার অর্থই তার ওপর বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করা।"[৮]

এই আলোচনা থেকে আমি একথা দাবী করব না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে তবলার ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তবে - কবিকে না জিজ্ঞেস করেই, এবং তাঁর আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবার অধিকার স্বীকার করে, বলতে হচ্ছে - তবলা যদি থাকেই তাহলে তাকে যান্ত্রিকভাবে ঠেকা না দিয়ে সংগীত-শিল্পীর অবচেতন মন থেকে উৎসারিত ছন্দকে সযত্নে অনুসরণ করে তার সত্যিকারের সাথী হতে হবে, যাতে তবলার ঠেকা সংগীত-শিল্পীর মাথায় "জলপূর্ণ কলস" চাপিয়ে না দেয়। এবং এজন্য অজানা শিল্পীর সঙ্গে একবারে সংগীত পরিবেশন মঞ্চে প্রথম মিলনের অপেক্ষায় না থেকে তবলা-শিল্পীর সংগীত-শিল্পীর সঙ্গে বাজাবার জন্য এবং তাঁর গানকে নিবিড় সখ্যতা দেবার জন্য সযত্নে অনুশীলন ও বোঝাপড়া করে নেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

[৭] Psycho-acoustics বৈজ্ঞানিক Fritz Winckelও একই কথা বলেছেনঃ "music is never concerned with absolute time and a gestalt (একটি জীবন্ত স্পন্দনের উপলব্ধি) is formed over a longer rhythmic unit." (Winckel: ৮২)
[৮] এইজন্য মেট্রোনোম বা ইলেকট্রনিক তবরার সঙ্গতের সঙ্গে গান অভ্যাস করা গানের জীবন্ত প্রকাশের জন্য ক্ষতিকর। (একথা হাসলার ও রড-মার্লিংও বলেছেনঃ "It is equally dangerous to practice runs, *coloratura* and so forth, to the beat of the metronome" হাসলার ও রড-মার্লিংঃ ১১২)).

সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রসংগীত

আমার এদেশে কোন কোন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকের সঙ্গে এবং রবীন্দসংগীত গায়কের সঙ্গেও, মতবিনিময় হয়েছে যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনা সৃষ্টিশীল হতে পারে না, কবি তো তাঁর সুর-তাল সব বেঁধে দিয়েছেন। এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথের ওপরই অত্যন্ত অবিচার করে, কারণ তিনি খুব স্পষ্টই তাঁর গান নিয়েই গায়নশিল্পীর সৃষ্টশীলতা দেখতে চেয়েছিলেন। আর সৃষ্টিশীলতা দেখাতে না পারলে তো গায়ককে 'শিল্পী' বলাই যায় না, কারণ শিল্পী সব সময় সৃষ্টি করে, না করলে সে 'শিল্পী' হয় না, বড়ো জোর দক্ষ 'কারিগর' হতে পারে। এমন কে আছেন যিনি সত্যিই প্রশ্নটি বুঝেও 'রবীন্দ্রসংগীত-কারিগর' হতে চান তা আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলেন, এবং বলেছিলেনঃ

"নতুন সৃষ্টির পথ যদি খোলা না'ই রইল তবে তা কিছুতেই শিল্পীর পাংক্তেয় হতে পারে না" ("আলাপ-আলোচনা",*সংগীতচিন্তা*: ১২২)।[১]

আরো বলেছিলেনঃ

"যে মানুষ গান বাঁধিবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তা হলে তো রসের গঙ্গাযমুনাসংগম। যে গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয়, তাহা যে তখন-তখনি জীবন-উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে, এটা অনুভব করিলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে" ("সংগীতের মুক্তি", *সংগীতচিন্তা*: ৫১)।

তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী সাহানা দেবী (ওরফে ঝুনু)কে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

"তুমি যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে - সে গানে আমি যতখানি আছি ততখানি ঝুনুও আছে - এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতিক্ষা আছে"।

---

[১১] এই সার্বজনীন কথাটি কবি বলেছিলেন দিলীপ রায়কে তাঁর গানে সুর-বিহার করবারও অনুমতি দিয়ে, তবে এই বলে যে তিনি এতখানি স্বাধীনতা শুধুমাত্র দিলীপ রায়দের মতো প্রতিভাবানদেরই দিতে রাজী। প্রতিভার চূড়ান্ত বিচার অবশ্য কালের হাতে - কবিরই কথায় *"সেটার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাল...সাময়িক মতামত* যে প্রায়ই শিল্পের বা শিল্পীদের relative value সম্বন্ধে ভুল করে থাকে এ কথা কে না জানে?" ("আলাপ-আলোচনা", *সংগীতচিন্তা*: ১০৯), তাই কবির এতখানি স্বাধীনতা দান গ্রহণ করে নিজেকে কালের বিচারের হাতে ছেড়ে দেবার অধিকার কবি দিয়ে গেছেন বস্তুত: সবাইকেই।

এই মিলনের অর্থ সংগীত-শিল্পী দ্বারা কবির দেয়া সুর অদলবদল করে মিলন নয়, এবং কবি সংগীত শিল্পীর এরকম স্বাধীনতা কখনোই সমর্থন করেন নি (কবির দেয়া সুর অদলবদল করলে সেটা আর রবীন্দ্রসংগীত থাকে না, 'অ-রবীন্দ্র' সংগীত হয়ে যায়)। তবু তিনি সাগ্রহেই তাঁর গান নিয়ে শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা দেখতে চেয়েছিলেন।

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন কবির দেয়া বাণী নিয়ে স্বরলিপিতে বাঁধা সুরে শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা দেখাবার যায়গা কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর অত্যন্ত সহজ। প্রশ্নটির উত্তর আমি এইভাবে দিয়ে এসেছি[১০]: শিল্পী আসবে কবির দেয়া বাণীর ঘরে, যে ঘরের মেঝেতে কবি তাঁর সুরের আলপনা এঁকে রেখেছেন, এবং এই ঘরে এই আলপনার ওপরে শিল্পী তার নিজের নাচ দেখাবে যে নাচ শিল্পীর নিজের সৃষ্টি। বাণী ও সুর গানের দুটি ডাইমেনশন্ যেগুলি কবির দেয়া; এই বাণী নিয়ে এই সুরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সংগীতঢেউএর সৌন্দর্যনাচের প্রতিটি ওঠানামা - অর্থাৎ তৃতীয় ডাইমেনশন্টি-তো কবি নির্দিষ্ট করে দেন নি - এই তৃতীয় ডাইমেনশন্টি আমাদের টু-ডাইমেনশনাল স্বরলিপিতে দেখানোই যায় না - এবং এখানে সংগীত-শিল্পীর যে স্বাধীনতা রয়েছে তা তো কবির বাণী ও সুরের বাঁধন নিয়েও সীমাহীন। স্বরলিপিতেতো সুর কাটাকাটা করে মাত্র দেয়া আছে কিছু মীড় ও স্পর্শসুর ছাড়া, যেখানে আমরা আগেই আলোচনা করেছি সুন্দর গান মাত্রই আশ-সহযোগে অর্থাৎ বয়ে বয়ে চলে, অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী যেমন বলেছেন: "*ভারতীয় স্বরলিপিতে আশ সহযোগে গাইবার কোনও নির্দেশজ্ঞাপকচিহ্ন থাকে না। কোনও নির্দেশজ্ঞাপক চিহ্ন না থাকলে সবসময় আশ সহযোগে গাইতে হয়। মনে রাখতে হবে, আশ্ গায়নই গাইবার সাধারণ বিধি (Legato is the general style), মীড় (gliding) বা কাটা কাটা গায়ন (short and detached) গানের মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়" (নীহারবিন্দু চৌধুরী ১২৬))* । স্বরলিপিতে এই বয়ে বয়ে চলা ও তার গতিময়তা দেখানো হয় না, দেখানো যায়ও না বয়ে যাবার লীলা বিচিত্র-জটিল-অন্তরঙ্গ বলে, আর তার ওপরে কবির "গড়ানে করে" বয়ে যাবার আহ্বান যা আরো অন্তরঙ্গ, তাও স্বরলিপিতে দেখানো হয় না (যায় না)। এই বয়ে-গড়ানে করে চলা তাই সংগীত-শিল্পীরই নিজস্ব আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি, তার নিজস্ব "সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ"। স্বরলিপিতে কোথাও কোথাও কিছু অলঙ্কারের নির্দেশ থাকে বিশেষ করে টপ্পা ধরণের কাজের, কিন্তু দক্ষ শিল্পী তার শিল্পচেতনা দিয়ে কোথাও কোথাও গমক্ ধরনের, এবং বিভিন্ন রকম ছোট্ট একটু-নেচে-নেয়া ধরণের কাজ, ইত্যাদি বিভিন্নরকম অলঙ্কার, নাচের অলঙ্কারের মতোই, দিয়ে থাকেন।

এর ওপরে বাণীর অর্থ অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের 'রং' বেছে নেয়ার, এবং বাণী অনুযায়ী শিল্পীর নিজের ইনটারপ্রিটেশনে কখনো বলিষ্ঠ কখনো হাল্কা করে গাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও

[১০] ১৯৭৭ সালে করকাতায় রবীন্দ্রসদনে রবীন্দসঙ্গীতের ওপর বক্তৃতায় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার ওপর প্রথম এই ব্যাখ্যা দিই।

শিল্পীর রয়েছে যেখানেও তার স্বকীয়তা দেখাবার সুযোগ অফুরন্ত। বিখ্যাত সংগীত-শিক্ষক শুভ গুহঠাকুরতা যেমন বলেছেন:

"রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত গায়কীর দখল পেতে হলে শিল্পীর নিজ কণ্ঠস্বরের ওপর এমন প্রভাব রাখতে হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। প্রত্যেকের কণ্ঠে তিনটি স্বর থাকে - স্বভাবিক, তীব্র ও মৃদু। সাধারণত: আমরা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলে থাকি আবার শোকে দু:খে স্বর ম্রিয়মান হয়, তেমনি উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসে তীব্র কণ্ঠস্বর ব্যবহার করি - সংগীতেও স্থানবিশেষে এই তিনটি স্বরের ব্যবহার অত্যাবশ্যক...ধ্রুপদ, দেশাত্ববোধক ও উদ্দীপক গানে যে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর প্রয়োজন, মৃত্যুদিনের গান বা বর্ষার একটি গান পরিবেশনে সে স্বর শুখশ্রাব্য নয়। এই ধরণের সংগীত পরিবেশনে অপেক্ষাকৃত মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর অপরিহার্য।...অনেকের মতে উদাত্ত কণ্ঠে অর্থাৎ গলা ছেড়ে গাইলেই গান শ্রুতিমধুর হয় - কিন্তু আমি এতে একমত নই।...একটি গানের বিশেষ বিশেষ যে সব স্থান শ্রেতাদের কানে আলোড়ন আনে তাতে অলঙ্কার বৈশিষ্ট্যও যেমন থাকে তেমনি থাকে স্বরবিন্যাসের তারতম্য।" (শুভগুহঠাকুরতা: ৫৫-৫৭)

এরকম নানাবিধ সৃষ্টির স্বাধীনতা আছে বলেই রবীন্দ্রসংগীত গাইতে এতো সত্যিকারের সংগীত-শিল্পীরা এসেছেন এবং এসে যাচ্ছেন - এই সৃষ্টির স্বাধীনতা না পেলে সত্যিকারের সংগীতশিল্পী রবীন্দ্রসংগীত গাইতে আসবেন কেন? এবং এই সৃষ্টির সঙ্গে মিলনের জন্যই কবির এই সাগ্রহ প্রতীক্ষা, যে আগ্রহ নিয়ে তিনি তাঁর বাণীর ঘরের মেঝেতে তাঁর সুরের আল্পনা এঁকে তার ওপর সৃষ্টিশীল সংগীত-শিল্পীর নাচ দেখবার প্রতিক্ষায় দিন কাটিয়েছেন।

তাই তো একই রবীন্দ্রসংগীত বিভিন্ন বড়োমাপের গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে এক রকম শোনায় না গানের সুর-তাল-লয় এক হলেও - এবং এই পার্থক্য শুধু কণ্ঠস্বকরের পার্থক্যের জন্য নয়, এটি শিল্পসৃষ্টিতে-পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে আরো গভীরতম এবং চূড়ান্ত কথা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন সংগীতেরই সংজ্ঞার ওপর তাঁর অমূল্য বক্তব্যে। যেমন:

"সুর-তালে ব্যপ্ত হয়ে থেকে সুর-তালের অতীত যা, সেই সংগীত।"
("আত্মকথা:পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি", *সংগীতচিন্তা*: ২০৩)

"যেখানে পদ্মফুলের নির্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমান সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার

সমস্তটার চেয়েও বেশি। এই বেশিটুকুই তার সংগীত।" ("সংগীতের মুক্তি", *সংগীতচিন্তা*: ৫৩)

অর্থাৎ শুধু সুর-তাল গাইলেই সংগীত হয় না, গান গেয়ে অনির্বচনীয়কে স্পর্শ করতে না পারলে তা গান হয় না, গানের আকার-আয়তনই শুধু দেখানো হয়। সমুদ্রের ঢেউএর নাচও তো তার সাকার অবয়ব দিয়ে অনির্বচনীয়ের সঙ্গে মিলবার অভিসারই। আর এই অভিসারের ফর্মূলাতো স্বরলিপিতে দেখানো যায় না, বস্তুতঃ এর কোন ফর্মূলা হতেই পারে না - এটি শিল্পীর নিজেরই অনুভূতি-আবেগ দিয়ে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তাকে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির স্বাদ দেবার প্রচেষ্টা যে প্রচেষ্টায় সুর-তাল-লয় অবলম্বন মাত্র, আসল রসটি তো শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি।

উপসংহারে বলা প্রয়োজন-যে রবীন্দ্রসংগীত শেখানো এইজন্য শুধু সুর-তাল শেখানোর ব্যাপার নয়, শিষ্যকে সুর-তাল ছাড়িয়ে নিজের সৃষ্টিশীল অনুভূতি-আবেগ দিয়ে অনির্বচনীয়কে স্পর্শ করতে চাইবার চেতনা ও প্রেরণা দেয়া, এবং তাকে এই প্রচেষ্টার জন্য কণ্ঠচালনায় দক্ষ হতে সাহায্য করা প্রত্যেক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকেরই কর্তব্য। অনেক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকই গান শেখাতে মূলতঃ গানের সুর-তাল-লয় ইত্যাদিই শেখান, শিষ্যদের শিল্পী হবার চেতনা দেন না এবং গান গেয়ে অপরূপকে রূপ দেবার চেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় রং-তুলিগুলোর সঙ্গে পরিচিত করান না এবং এই রং-তুলিগুলির ব্যবহারে শিষ্যদের দক্ষ করে তুলতে প্রয়াস করেন না। ফলে অনেক শিষ্যরাই শুধু যান্ত্রিকভাবে সুর-তালই শেখেন,এমনকি অনির্বচনীয়কে নিজের আঁকা রূপ দেবার প্রয়াসের বদলে গুরুর গায়কীও অনুকরণ করেন। অনুকরণ কোন শিল্পীরই যোগ্য কাজ নয়। অনুকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, "অবিকল নকল দেখিলেই বোঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নি" ("সংগীত ও ভাব", *সংগীত চিন্তা*: ৩) - ভাব আয়ত্ত করতে পারলে তার নিজস্ব প্রকাশে গান তার নিজস্ব শিল্প হতো, অনুকরণ হতো না।

আশা করতে ইচ্ছে হয় যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার সঙ্গে শিষ্যদের পরিচিত করাতে মনোনিবেশ করবেন, এবং তাদের সত্যিকার রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী হবার চেতনা দিয়ে তাদের এই পথে যেতে সাহায্য করতে ও তার জন্য গড়ে তুলতে সচেতন ও সচেষ্ট হবেন।

*করুণাময় গোস্বামী সম্পাদিত *দিনের শেষে ঘুমের দেশে, আবদুল আহাদ স্মারকগ্রন্থ,* অনুপম প্রকাশনী (২০০৪), থেকে পুনর্মুদ্রিত

পুস্তক-নির্দেশিকা

আনিসুর রহমান, *অসীমের স্পন্দ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বোধ ও সাধনা.* ইউ,পি,এল্, ঢাকা, ও নয়া উদ্যোগ, কল্কাতা. ১৯৯৫।
নীহারবিন্দু চৌধুরী, অধ্যাপাক, *কণ্ঠসঙ্গীত সাধনা,* বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা ও প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৮০।
সত্যজিত রায়, "রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা", *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা*, সুব্রত রায় সম্পাদিত, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৩।
শুভ গুহঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা,* 'দক্ষিণী' প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা ১৩৬৬।
সুবিনয় রায়, *রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনা,* এ, মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৬৯।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ *সংগীতচিন্তা* , বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৬।
Apel, Willie, & Ralph T. Daniel: *The Harvard Brief Dictionary of Music,* Washington Square Press, New York, 1961.
Cornelius L. Reid. *Bel Canto: Principles and Practices*. Music House. New York. 1950.
Fredrick Husler & Yvonne Rodd-Marling . *Singing: The Physical Nature of the Vocal Organ, A Guide to the Unlocking of the Singer's Voice*. Hutchinson. London. 1976.
Fritz Winckel. *Music, Sound and Sensation, A modern exposition*. Dover Publications, New York. 1967